বাঙালির মুখে মুখে গদ্যের ব্যবহার চিরকালইপ্রচলিত ছিল দৈনন্দিন কর্মক্ষেত্রে বাঙালি যে আধুনিক যুগের আগে পদ্যে কথা বলত, তা নয়। আধুনিক যুগের বৈশিষ্ট্য এই যে, যে গদ্য বাঙালির দৈনন্দিন ব্যবহারে প্রচলিত ছিল, সাহিত্যে তার প্রয়োগ সূচিত হল অর্থাৎ গদ্যসাহিত্য রচনার সূত্রপাত হল।

সাহিত্যে ব্যবহৃত গদ্যেরও আবারও দুটি রীতি গড়ে উঠল—সাধু ও চলিত। মূলত পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা ও তার নিকটবর্তী অঞ্চলের (হুগলি, হাওড়া, নদিয়া, উত্তর ২৪ পরগনা ইত্যাদি) কথ্যভাষার উপরে ভিত্তি করে চলিত গদ্যের রূপ গড়ে তোলা হয়েছিল, অন্যদিকে মূলত মধ্যযুগীয় বাংলার শব্দরূপধাতুরূপ ও প্রধানত সংস্কৃত শব্দভাণ্ডার নিয়ে সাধু গদ্য গড়ে তোলা হয়েছিল। যদিও সাধু এবং চলিত গদ্যের ধারা ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রায় সমান্তরালভাবে প্রবাহিত হয়েছিল, তবু উনবিংশ শতাব্দীতে সাধুগদ্যের ধারাটিই অপেক্ষাকৃত অধিক পুষ্টি লাভ করেছিল। পরে ক্রমে চলিত গদ্যের ধারাটি একচ্ছত্র উঠে।

সাধুভাষায় ক্রিয়া, সর্বনাম ও অনুসর্গের পূর্ণতর দীর্ঘরূপ বজায় ছিল।
যেমন-করিয়া, করিয়াছিল, তাহার, যাহার, হইতে ইত্যাদি।

চলিত ভাষায় এগুলির সংক্ষিপ্ত রূপ প্রচলিত হল।
যেমন-করে, করেছিল, তার, যার, হতে, থেকে ইত্যাদি।

মধ্যযুগের বাংলায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে অপিনিহিতি বা বিপর্যাসের ফলে শব্দ-মধ্যবর্তী ‘ই’ বা ‘উ’ তার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের পূর্বে উচ্চারিত হত (যেমন- করিয়া > কইর‍্যা ইত্যাদি) ; আধুনিক যুগের আদর্শ চলিত বাংলায় অপিনিহিতির পরবর্তী ধাপের ধ্বনি পরিবর্তন অভিশ্রুতি সংঘটিত হল (যেমন- কইর‍্যা > করে ইত্যাদি)।

আধুনিক চলিত বাংলায় শব্দের মধ্যে পাশাপাশি বা কাছাকাছি অবস্থিত দুটি বিষম স্বরধ্বনি স্বরসঙ্গতির প্রক্রিয়ায় সমীভূত হয়ে একই রকম বা প্রায় একই রকম স্বরধ্বনিতে পরিণত হল। যেমন—দেশি > দিশি, পটুয়া > পোটো। ইত্যাদি।

মূল ক্রিয়ার ধাতুর সঙ্গে অনট্ (অন) প্রভৃতি প্রত্যয় যোগ করে প্রথমে ক্রিয়াজাত বিশেষ্য পদ রচনা করা হয়। যেমন-গম্ + অনট (অন) == গমন
তারপর তাকে পূর্বপদ রূপে গ্রহণ করে কৃ (কর) ধাতুর সঙ্গে ক্রিয়ার বিভক্তি যোগ করে নানা যৌগিক ক্রিয়া ব্যবহার করা হয়। যেমন--গমন করা
এই রকমের যৌগিক ক্রিয়াপদ প্রথমে সাধুভাষায় ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হত। পরে কিছু কিছু যৌগিক ক্রিয়াপদের ব্যবহার চলিত ভাষাতেও স্বাভাবিক হয়ে উঠে। যেমন— গান করা
অন্যদিকে সাধুভাষা যতই সরল ও স্বাভাবিক হয়ে আসে ততই সাধু ভাষাতে আবার যৌগিক ক্রিয়াপদের ব্যবহার কমে আসে।

আধুনিক বাংলায় দুটি সংযোজক অব্যয়ের (CONJUNCTION) (ও, এবং) ব্যবহার খুব বেশি। এই দুটির মধ্যে ‘এবং’ সাধারণত দু'টি বাক্যকে যোগ করে, ‘ও’ যোগ করে দু’টি পদকে, যদিও এই নিয়মের ব্যতিক্রম কম নয়। এই দুটি সংযোজক অব্যয়ের মধ্যে এবং আগে থেকেই প্রচলিত। ও’ হল আধুনিক বাংলার বৈশিষ্ট্য। ড. সুকুমার সেনের মতে এটি ফারসি ‘ব’ (WA) থেকে এসেছে।

আধুনিক বাংলার বাক্যগঠনরীতির একাধিক বৈশিষ্ট্যের কথা আগে আলোচনা করা হয়েছে (পৃঃ ৩৯৫-৪০৩)। একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল নঞর্থক অব্যয় ‘না’, ‘নাই’, ‘নি’ বসে সমাপিকা ক্রিয়ার পরে (যেমন--রামচন্দ্র সত্যভঙ্গ করেন নি), এবং অসমাপিকা ক্রিয়ার আগে (যেমন--রামচন্দ্র সত্যভঙ্গ না করে চিরকাল সৎপথে চলেছেন)।

কিন্তু বিশেষ ক্ষেত্রে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় এবং নঞর্থক অব্যয় সমাপিকা ক্রিয়ারও আগে বসে। যেমন—মেয়েটি না স্নান করল, না খেলো, না ঘুমালো, সারাদিন মন খারাপ করে চুপ করে বসে রইল।

একাধিক সরল বাক্যকে সংযোজক অব্যয় দিয়ে যোগ করে যৌগিক বাক্য রচনা করা যায়। যেমন- রামচন্দ্র বনে গেলেন এবং পঞ্চবটীতে বাস করতে লাগলেন। এরকম সংযোজক অব্যয় দিয়ে যোগ না করে পূর্ববর্তী বাক্যের সমাপিকা ক্রিয়াকে অসমাপিকা ক্রিয়ায় পরিবর্তিত করেও বাক্য দু'টিকে যোগ করে একটিমাত্র সরল বাক্য রচনা করা যায়। এটি আধুনিক বাংলার বৈশিষ্ট্য। যেমন রামচন্দ্র বনে গিয়ে পঞ্চবটীতে বাস করতে লাগলেন।

ভাষাঋণের বিভিন্ন সূত্র ধরে বাংলায় বিভিন্ন ভাষা থেকে উপাদান গৃহীত হয়। প্রধানত ইংরেজি ভাষা থেকে বহু শব্দ আধুনিক বাংলায় গৃহীত হয়।
যেমন—চেয়ার (CHAIR), টেবিল (TABLE), রেডিও (RADIO) ইত্যাদি। কিছু কিছু ইংরেজি শব্দ বাংলায় গৃহীত হবার পর বাংলা ভাষার নিজস্ব উপাদানের সঙ্গে মিলে এমন পরিবর্তিত হয়ে দেশীয় (NATURALISED) রূপ লাভ করেছে যে তাদের বিদেশি শব্দ বলে চেনাই যায় না। যেমন--LORD > লাট, CHORD > কার (লাল কার, কালো কার), LANTERN > লণ্ঠন ইত্যাদি।
শব্দ ছাড়াও কিছু কিছু বাক্য, বাক্যাংশ, শব্দগুচ্ছ ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ করে নেওয়া হয়েছে। যেমনUNIVERSITY > বিশ্ববিদ্যালয়, WRIST WATCH > হাতঘড়ি, HE WILL PLACE HIS OPINICN NOW > এবার তিনি তাঁর বক্তব্য রাখবেন।

ছন্দোরীতিতে নানা বৈচিত্র্য আধুনিক বাংলার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। পুরানো পয়ার ছন্দ থেকে অমিত্রাক্ষর ও গৈরিশ ছন্দের জন্ম তো হলই, আধুনিক কবিতায় গদ্যচ্ছন্দেরও সূচনা হল। এছাড়া বাংলায় ইংরেজি ও সংস্কৃত ছন্দের ব্যবহারও দেখা দিল।